করলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ সরকারের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাবে। বিশ্বের চোখে শেখ হাসিনা এবং তার সরকার খুনি হিসেবে চিহ্নিত হবে। বিরোধী কোন নেতাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার ঘটনা রাজনৈতিক নিপীড়নের নগ্ন উদাহরণ। কোনো ধরনের তত্ত্বাবধান বা বিদেশী মনিটরিং এই বিচারে ছিল না। ত্রুটিপূর্ণ এই বিচারিক প্রক্রিয়াটি সরকারের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার একটি কৌশল। এই অন্যায় বিচার দেশে সহিংসতা ও বিভাজনকে আরও বৃদ্ধি করবে। যদিও ১৯৭১ এর ক্ষত সারানোর জন্য এই বিচার শুরু হয়েছে মর্মে সরকার দাবি করছে কিন্তু আসলে এর মাধ্যমে সরকার বিরোধী পক্ষকে দমিয়ে রাখতে চায়। এই বিচারে আসামী পক্ষকে নানা সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

দ্য ইকোনোমিস্ট

বিশ্ব বিখ্যাত পত্রিকা 'দ্য ইকোনোমিস্ট' এক রিপোর্টে বলে, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ বর্তমান সরকারের শাসনামলে নির্বাহী বিভাগের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। পত্রিকাটি আরও বলে, একই পরিবারের ৬ জন সদস্য হত্যার দায়ে মোল্লাকে ফাঁসি দেয়া হলেও প্রসিকিউশন এই অভিযোগের স্বপক্ষে মাত্র একজন সাক্ষী এনেছিল যার বয়স ঐ ঘটনার সময় ছিল মাত্র ১৩ বছর।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার পরিবারের ৯ প্রশ্নের উত্তর দিবে কে?

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার আপিলের রায়ের পর পরিবারের পক্ষ থেকে জাতির সামনে ৯টি প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।

এক. চলতি বছরের ৫ই ফেব্রুয়ারী ট্রাইব্যুনালের দেয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সাজার পরে তথাকথিত গণজাগরণ মঞ্চের চাপের মুখে ১৮ ফেব্রুয়ারী আইন সংশোধন করে সংশোধিত আইনে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডের যে রায় প্রদান করা হয়েছে তা আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

দুই. ৬নং অভিযোগে হযরত আলী লস্কর পরিবার হত্যাকাণ্ডে মাত্র একজন সাক্ষী মোমেনা বেগমের স্বাক্ষ্যর ভিত্তিতে ফাঁসির রায় দেয়া হল, যা বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ইতিহাসে নজিরবিহীন। অবাক করা ব্যাপার হলো, সাক্ষীর বয়স ঘটনার সময় ছিল মাত্র ১৩ বছর। এমন রায় কি আদৌ গ্রহণযোগ্য?

তিন. হযরত আলী লস্করের মেয়ে সরকারের সাক্ষী মোমেনা বেগম ২৮.০৯.২০০৭ তারিখে মিরপুরের জল্লাদখানায় মুক্তিযোদ্ধা যাদুঘরের জাহেদা খাতুন তামান্নার কাছে দেয়া সাক্ষাতকারের কোথাও তার পরিবারের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আব্দুল কাদের মোল্লার নাম বলেননি। সাক্ষাতকার থেকে আরো জানা যায় যে, তিনি ঘটনার সময় তার কেরানীগঞ্জের শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন এবং ঘটনার পরে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। জল্লাদখানার কাগজপত্র আপিল বিভাগে উপস্থাপন করার পরেও এমন একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য বিবেচনায় এনে কিভাবে এই ফাঁসির রায় দেয়া হলো?

চার. আরো বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এই মোমেনা বেগম মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে ১৩.০৮.২০১১ তারিখে দেয়া জবানবন্দিতে কোথাও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারী হিসেবে আব্দুল কাদের মোল্লার নাম বলেননি। স্বাধীনতার ৪২ বছর পরে দ্বিতীয়বারের মতো নিজ পরিবারের হত্যাকাণ্ডের কথা বলতে এসে মোমেনা বেগম কেন

একটিবারের জন্য আব্দুল কাদের মোল্লার নাম বললেন না, এটা চরম অবাক করার ব্যাপার। আরো হতবাক করা ব্যাপার এই যে, এই সাক্ষীর সাক্ষের ভিত্তিতে কিভাবে আপিল বিভাগ ফাঁসির সাজা দিলেন?

পাঁচ. অথচ ১৭.০৭.২০১২ তারিখে মোমেনা বেগম ট্রাইবুনাল-২ এ এসে আব্দুল কাদের মোল্লার নাম হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন। সাক্ষ্য দেওয়ার পর মোমেনা বেগমকে ডিফেন্স পক্ষের জেরায় আব্দুল কাদের মোল্লাকে তার পরিবারের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকতে স্বচক্ষে দেখেছেন- এই কথা অস্বীকার করেছেন ও পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। এই সাক্ষ্যর ভিত্তিতে বিচারকরা কিভাবে ফাঁসির আদেশ দিলেন?

ছয়. আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা মনোয়ারা বেগমের জবানবন্দি ও জেরা থেকে জানা যায় মোমেনা বেগমকে ৩নং অভিযোগ সাংবাদিক খন্দকার আবু তালেব হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। অথচ মোমেনা বেগম এসে সাক্ষী দিলেন ৬নং অভিযোগে। এ অদ্ভুত ব্যাপারগুলো আমলে না নিয়ে এই অভিযোগ ও সাক্ষীর ভিত্তিতে কিভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল?

সাত. কেন এমন একজন অপরাধীর (?) বিরুদ্ধে একজন চাক্ষুষ সাক্ষীও পাওয়া গেল না? বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় উল্লেখিত সমাজের চিহ্নিত সন্ত্রাসী, বিচারকের জমি দখলকারী, চাঁদাবাজ লোকদেরকে সরকারের সাক্ষী বানানো হলো কেন?

আট. অপর দিকে আব্দুল কাদের মোল্লার পক্ষে অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, চল্লিশ বছর ধরে চাকরি করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমাম, হিন্দু ধর্মালম্বী প্রমুখ ব্যক্তিগণের দেয়া সাক্ষ্য বিবেচনায় নেয়া হলো না কেন?

নয়. আব্দুল কাদের মোল্লা ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে অধ্যয়ন করেছেন, ১৯৭৪-৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন, ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স কলেজের সিনিয়র শিক্ষক ও পরবর্তীতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য ও পরপর দুইবার ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন, স্বৈরাচার বিরোধী ও কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টির বিভিন্ন জাতীয় নেতাদের সাথে লিয়াজোঁ কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এগুলো কোনো কিছু বিবেচনায় না এনে শুধু রাজনৈতিক কারণে যে ফাঁসির রায় দেয়া হল তা কি মেনে নেয়া যায়?

গায়েবানা জানাযার খণ্ডচিত্র